সেই আশ্চর্য সন্ধ্যা

শঙ্করলাল ভট্টাচার্যের গল্প

অঝোর বৃষ্টিতে হঠাৎ এক আকাশ-জমি আলোকরা বিদ্যুৎচমকে প্রিয়ব্রত প্রথম দেখেছিল অরুণাকে। অরুণা কোনোক্রমে ভিজে শাড়ির আঁচল দিয়ে আড়াল করছিল বুকে ধরা খানকতক বইকে। বই বাঁচাতে গিয়ে আঁচলটাকে ঘোমটা করে মাথাটা বাঁচাতে পারেনি। ছাতা হাতে প্রিয়ব্রতকে দেখে বুঝি-বা একটু আর্ত চোখেই তাকিয়েছিল। বিদ্যুৎ মিলিয়ে যেতে ফের সেই ঘোর অন্ধকার। কিন্তু প্রিয়ব্রত আর ইতস্তত করেনি, ও দ্রুত পায়ে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলেছিল, আসুন আমার ছাতার নীচে। কোন দিকে যাবেন?

ওয়েলিংটন পার্কের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে প্রিয়ব্রতর এই দেড়খানা কথায় শরীরের সমস্ত ক্লান্তি নিমেষে উবে গিয়েছিল অরুণার। বিদ্যুতের আলোয় ও খেয়াল করেছিল যুবকের চশমার কাচ বেশ পুরু। ছাতার নীচে চলে এসে ও প্রথমে বলল, কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব!

সঙ্গে সঙ্গে ওর কথার মধ্যে প্রিয়ব্রত ঢুকে পড়ল, ধন্যবাদ কেন? অন্ধকারে এই যে হাঁটা এবং ভেজার সঙ্গী পেলাম, এর ধন্যবাদটা...

-না, থাক। অ্যাই সামনে গর্ত, দেখে!

বলতে বলতে গর্তর পাশ থেকে হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিল প্রিয়ব্রতকে অরুণা।

প্রিয়ব্রত বলল, এবার কিন্তু আমায় বলতেই হচ্ছে ধন্যবাদ।

অরুণা বলল, বলুন, কিন্তু আমার হাতটাও ছাড়বেন না।

তারপর বাকি রাস্তা অরুণার হাতটা ছাড়েনি প্রিয়ব্রত। কথায় কথায় জানল অরুণা থাকে তালতলায়, ফলে প্রিয়ব্রতর ক্রিক রো পাড়ার কাছেই। জানল অরুণা ডাক্তারির ফাইনাল দিয়েছে হালে, পাস করে বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে।

বিদেশে কেন? দেশে কি ডাক্তারির সুযোগ নেই? সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে বসেছে প্রিয়ব্রত।

বৃষ্টির ঝমঝমের মধ্যেও অরুণার হাসিটা শুনতে পেয়েছিল প্রিয়ব্রত—তা থাকবে না। কেন? তবু তো জানেন একটা বিলিতি তকমার এখনও কী মূল্য এদেশে।

প্রিয়ব্রত আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বলেছিল, অ!।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটার পর অরুণা অনুভব করল ওর হাতের ওপর প্রিয়ব্রতর হাতের মৃদু চাপ। ও একটু কেঁপে উঠে বলেছিল, হ্যাঁ, কিছু বলছেন?

প্রিয়ব্রতর সরল প্রশ্ন তখন, আপনার নামটাই জানা হল না...

–অরুণা রায়। আপনার?

–প্রিয়ব্রত মজুমদার।

—বেশ নামটা আপনার, কবি কবি।

–কেন বলছেন?

–কেন আবার, কলেজে দর্শন পড়াই। যাকে বলে গনকেস।

প্রিয়ব্রত অনুভব করেছিল অরুণা আরও শক্ত করে ধরল ওর হাতটা, সহানুভূতি আর ভরসার ছোঁয়া তাতে। খুব আশ্বস্ত বোধ করেছিল ও, তাই আমতা আমতা করে জিজ্ঞেসও করে বসল, দর্শন আপনার অপছন্দ নয় তাহলে?

তখন বাস্তবিকই আন্তরিক শোনাল অরুণার কন্ঠ, অপছন্দ মানে? আই অ্যাম ট্রলি ফণ্ড অব ফিলোজফি। ডাক্তারি পড়েছি বলে এতটা নীরেস ভাববেন না। আর কী জানেন? বহুদিন পর

একজন দর্শন-পড়া লোকের সঙ্গে পরিচয় হল।

প্রিয়ব্রত বলল, বেটার লেট দ্যান নেভার। তাই না?

অন্ধকারে ঝমঝমে বৃষ্টির মধ্যে এক সুদূর কন্ঠধ্বনিতে অরুণার উত্তর এল, একটু দেরি হল বই কী! মাস তিনেক।

হঠাৎ কীরকম শীত শীত করে উঠল প্রিয়ব্রতর। তিনমাস এতদিন দেরি করিয়ে দেয়। ওর হাত থেকে অরুণার হাতটা আপনা-আপনি খসে গেল। শুনল অরুণা বলছে, ওই আমার বাড়ি! আপনি কী একটু ভিতরে আসবেন? একটু কফি?

প্রিয়ব্রত তখনও দেরির ধাক্কাটা সামলে উঠতে পারেনি, কীরকম আনমনাভাবে বলেছিল, কফি? না, না, কফি না। এমনিই একটু আসতাম না হয়।

তবু বৈঠকখানায় বসিয়ে অরুণা নিজের হাতে কফি বানিয়ে এনে দিয়েছিল প্রিয়ব্রতকে। কাপটা হাতে তুলে দিতে দিতে জিজ্ঞেস করেছিল, কী হল মশাই, মুডটা কীরকম বদলে গেল যেন?

কাপটা হাতে ধরে সেই আনমনাভাবেই বলেছিল প্রিয়ব্রত, বিয়েটা করেই তাহলে বিদেশে যাচ্ছেন?

প্রিয়ব্রতর মুখে সহসা 'বিয়ে' শব্দটা শুনে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল অরুণা, সেই ভাবটা কাটতে কিছুটা বিব্রতভাবে বলল, সেইরকমই তো কথা। তারপর প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য বলল, যাক সেসব কথা। আপনার কথা বলুন।

এবার প্রিয়ব্রতর অপ্রস্তুত হওয়ার পালা। এক চুমুক কফি খেয়ে গরম কাপে হাত সেঁক দিতে দিতে বলল, আমার আর কী কথা। কলেজ যাই, পড়াই। বাড়ি ফিরে বইয়ের পাতা ওলটাই, খাই-দাই, ঘুমোই।

অরুণার এবার স্পষ্ট প্রশ্ন, কেন বিয়ে করেননি?

আবার কফিতে চুমুক দিয়ে প্রিয়ব্রত বলল, কই আর হল!

-কেন, ইচ্ছে হয়নি?

–তা বলব না। ইচ্ছে হয়েছে, তবে একটু দেরিতে মনে হয়।

—দেরিতে? বান্ধবীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল?

—ঠিক তা না। বিদ্যুতের আলোয় একঝলক তাকে দেখে মনে হয়েছিল ওর কাছে যাই। কী জানি কেন মনে হল, এ-ই সে। সে আমার পাশে হাঁটা শুরু করাতে মনে হল, এই সেই সময়। আমার হাতে ওর হাত, মাথার ওপর দু-জনের একটাই ছাতা...মনে হল কাউকে যে কখনো এভাবে ভালো লাগেনি সেটাই মঙ্গল। ... কিন্তু, কিন্তু আমার একটু দেরিই হয়ে গেল।

প্রিয়ব্রতর আর কিছু মনে পড়ে না সেদিনের সেই সন্ধ্যার। বিদ্যুৎচমক থেকে নিজের ওই সংলাপ অবধি অবশ্য সবটুকুই ওর মনে পড়ে সত্যজিতের 'চারুলতা' ছবির শেষ ক-টি দৃশ্যের মতো। আর বারবার সেই দৃশ্যগুলোই ফিরে ফিরে আসছে টেবিলের ওপর যত্ন করে মেলে রাখা চিঠিটার দিকে তাকালে।

চিঠিটা তালতলার অরুণা বসুর।

যোলো বছর আগে এরকমই এক বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় যে অরুণার—তখন রায়পাশাপাশি এক ছাতার তলায় হাঁটতে হাঁটতে প্রিয়ব্রতর ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, সব কিছুতেই ওর যেন একটু দেরি হয়ে যায়।

সেই সন্ধ্যায় অরুণাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওর মনে হয়েছিল, কেন জিজ্ঞেস করলাম না ও কি বাগদত্তা? বিয়ের আগে কত সম্বন্ধই তো দেখা হয়, সব কি পাকা হয়?

প্রিয়ব্রত রাস্তার মোড় অবধি গিয়ে ফিরেও এসেছিল, কিন্তু অরুণাদের বাড়ির কলিং-বেলে আঙুল রেখেও সেটা টিপল না। কী জিজ্ঞেস করা যায় অরুণাকে ঠিক এই সময়? একটা বিলেতমুখী পাত্রের থেকে মুখ ঘুরিয়ে একটা দর্শনের অধ্যাপকের সঙ্গে জোড় বাঁধার প্রস্তাব দেবে? এটা নাটক-নভেলে চলে যেতে পারে, তাই বলে বাস্তব জীবনে?

প্রিয়ব্রত ফের বাড়ির পথ ধরেছিল, যেতে যেতে একটা সিগারেট ধরিয়ে ট্রামরাস্তার পাশে দাঁড়াল। হঠাৎ করে ওর প্রিয় দার্শনিক লুডভিগ ভিটগেনস্টাইনের একটা কথা মনে পড়ে যেতে মাথার ওপর থেকে ছাতাটা সরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল ও। ভিটগেনস্টাইন ভাষার অক্ষমতার কথা বলেছিলেন। ওঁর গ্রন্থ 'ট্রাক্তাতুস লোজকো-ফিলোজফিকুস'-এ বলেছিলেন, ভাষা দিয়ে নিখুঁত নৈপুণ্যে কিছুই বলে ফেলা যায় না। কাজেই যা ভাষায় পূর্ণ করে বলা যাবে নাসে-বিষয়ে নীরব থাকাটাই শ্রেয়। প্রিয়ব্রত মনে মনে ক-বার আউড়াল প্রিয় দার্শনিকের fez croit–'Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.'

অরুণার সামনে বসে বুকের মধ্যে একটা ছোট্ট আন্দোলন অনুভব করেছিল প্রিয়ব্রত। তা কী প্রেম? তা কী প্রণয়? তা কী ভালোবাসার অনুভূতিটার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ কিছুরই হদিশ করতে পারেনি প্রিয়ব্রত, তাই কিছুটা চুপ মেরেই বসেছিল। তারপর রাস্তায় আকাশ দেখতে দেখতে ভাবল, প্রেম কী ভাষা? না নৈঃশব্দ্য? প্রেমেও কী সময়-শৃঙ্খলা থাকতে হয়? ভালোবাসায় দেরি হয় কেন?

এইসব ভাবনার মধ্যেই একটা গাড়ি খানিকটা কাদাজল ছিটিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ওর গায়ে, অন্ধকারে চশমার কাচ মুছতে মুছতে যখন ও বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পৌঁছোল ওর মাথায় ততক্ষণে ভর করেছে এক ফরাসি কবির পঙক্তি, যেখানে কবি বলেছেন, একটা সেতু পার হতে হতেও তিনি একটু একটু বদলে যান। প্রিয়ব্রতর মনে হচ্ছিল, একটা বর্ষার সন্ধ্যায় ওয়েলিংটন পার্ক থেকে তালতলা হয়ে ক্রিক রো আসতে আসতেও ও কিছুটা বদলে গেছে। এত অল্প সময়ের মধ্যেও কী মানুষ এতখানি বদলে যায়? বদলাতে পারে?

অরুণা বসুর চিঠিটা ফের একবার হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল প্রিয়ব্রত। ভণিতা-টনিতা কিছু নেই, খুব স্বচ্ছ। স্বাভাবিকভাবে কয়েকটা কথা বলা আছে, কিন্তু সেই স্পষ্ট, স্বাভাবিক কথাগুলোই লক্ষ দ্যোতনা বহন করে আনছে প্রিয়ব্রতর মনের আনাচে কানাচে।

অরুণা লিখেছে—

প্রিয় অধ্যাপক মজুমদার,

জানি না আমাকে আপনার আর মনে আছে কিনা। যোলো বছর আগে এক সন্ধ্যায় আপনি আমাকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। তারপর আশায় আশায় ছিলাম আপনি ফের একদিন আসবেন। আসেননি। ইচ্ছে ছিল বিদেশ পাড়ি দেওয়ার আগে একবার অন্তত আপনার সঙ্গে দেখা করার। কেন যে সেটা শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল না আজ মনে নেই। আপনি জানতে চাইতেই পারেন যে যোলো বছরে এই আমার প্রথম দেশে আসা কিনা ; উত্তর হল, না। এই আসা পঞ্চম। জানতে চাইতেই পারেন আগের চারবার আপনার খোঁজ

নিইনি কেন। আর এবারই বা কেন স্মরণ করলাম। এর সমস্ত উত্তরই আপনাকে দেব, যদি একবারটি আসেন।

ইতি
অরুণা বসু

প্রিয়ব্রতর মনে হল ষোলো বছর পর নতুন করে পুরোনো প্রশ্ন তোলার কোনো মানে থাকবে না। অরুণাকে দেখার জন্য যাওয়া নিশ্চয়ই যায়, তাই বলে পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে কার কী লাভ? সেই তো একই প্রশ্ন—কেমন আছেন? বিয়ে করলেন না কেন? একা লাগে না? কী করে সময় কাটান?—এর বাইরে কীই বা আর বলার আছে? প্রশ্নগুলো কয়েকবার মনের মধ্যে রগড়ে নিয়ে প্রিয়ব্রত চিৎ হয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ল। আর খুব ক্লান্ত লাগল ওর।

প্রিয়ব্রতর মনে পড়ল বাড়ি ফিরে সেই সন্ধ্যায় ও দোতলায় সিঁড়ির মুখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছিল এ এক ধরনের এপিলেপসি। বহুকাল শরীরে লুকিয়ে থেকে হঠাৎ বিস্ফোরিত হয়েছে। মা বলেছিলেন ছেলের বেজায় তড়কা হত বাল্যে, কাঁপুনি দিয়ে মৃগীতে ধরত। তারপর একসময় কেটেও যায়। এ বোধ হয় সেই মৃগীরই নতুন উপদ্রব।

জ্ঞান হয়ে প্রিয়ব্রত প্রথম যে দৃশ্যটি চোখের সামনে ভেসে উঠতে দেখে সেটি অরুণার মুখ, বৃষ্টিতে ধোওয়া, হঠাৎ বিদ্যুতের আলোয় ভেসে ওঠা। যদি প্রেমে পড়া বলতে সত্যিই কিছু হয়ে থাকে প্রিয়ব্রতর জীবনে তবে সেটা ঘটেছিল ওই মুহূর্তেই। কোথায় ভয়? কোথায় দ্বন্দ্ব? সব কীরকম মুছে গেল জ্ঞানে ফিরে সন্ধ্যার সেই অলৌকিক দৃশ্যটি মনে পড়ায়। পরদিন সকালে একটু সুস্থ হয়েই প্রিয়ব্রত জীবনের প্রথম প্রেমপত্রটি লেখে অরুণাকে।

এখনও মনে আছে প্রিয়ব্রতর যে এগারো পৃষ্ঠার চিঠিটা উত্তরোত্তর আবেগ ও প্যাশনে ছেয়ে গিয়েছিল এবং শেষ হয় একটা প্রচ্ছন্ন বিয়ের প্রস্তাবে। লেখা হয়ে যাওয়ার পর কতবার যে সেটি প্রিয়ব্রত পড়েছিল এবং কিছু শব্দের সংস্কার করেছিল বলা মুশকিল, কারণ সমস্তটাই ঘটেছিল কেমন একটা ঘোরের মধ্যে। শেষবার চিঠিটা পড়ার পর এবং শেষ সংশোধনটুকু করার পর যেন সংবিৎ ফিরে পায় প্রিয়ব্রত। ছি! ছি! মাত্র দু-আড়াই ঘন্টার আলাপের পর কোনো মহিলাকে এ চিঠি লেখা যায়? বাগদত্তা কোনো মেয়ের কাছে এই প্রস্তাব রাখা যায়? প্রিয়ব্রতর হঠাৎই যেন নিজেকে খুব অচেনা লাগাতে শুরু করে। অরুণার হাতে হাত রেখে ওর পাশাপাশি ওইটুকু হাঁটাতেই একটা মানুষ এতখানি বদলে যেতে পারে? ফরাসি কবিটি কে যেন? পল ভালেরি? যিনি অনুভব করেছিলেন যে, একটা সেতু পার হতে হতেও তিনি যেন একটু একটু বদলে যান?

ঠিক তখনই ফের ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছিল, আর ভালো করে বৃষ্টি দেখার টানে প্রিয়ব্রত ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল। দেখতে পেল দিগন্ত ছেয়ে বৃষ্টি হচ্ছে, যতদূর চোখ যায়। আর মনে পড়ে যায় ওর অপর প্রিয় ফরাসি কবি পল ভের্লেনের ক-টি পঙক্তি; ও আবৃত্তি শুরু করে—
‘শহরের ওপর বৃষ্টি নেমেছে,/ বৃষ্টি পড়ছে সমস্ত বাড়ির ছাদের ওপর, /বৃষ্টি ঝরছে আমার হৃদয়ের ওপর।

ওই সময়ই প্রিয়ব্রত দ্বিতীয়বার জ্ঞান হারায় এবং জ্ঞান ফিরে দেখে ও হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে। বন্ধু চঞ্চল ওকে দেখতে এসে বলেছিল ওর টেবিলে পড়ে থাকা চিঠিটা নিয়ে নাকি বাড়িতে বেজায় আলোচনা হয়েছে—মেয়েটি কে? কোথায় আলাপ প্রিয়র সঙ্গে? প্রিয় কি সত্যিই বিয়ে করতে চায়? তাহলে অ্যাদ্দিন ধরে সম্বন্ধ দেখাদেখি নিয়ে ওর এত

আপত্তি এই জন্যই?

মেয়েটির ঠিকানা কী? চিঠি পড়ে তো মনে হয় তার বিয়ে হতে চলেছে; তাহলে? আর প্রেমেই যদি পড়েছিস তো এত দেরিতে টনক নড়ল কেন?

সবার সব মন্তব্য শোনানোর পর চঞ্চল নিজের প্রশ্নটা রেখেছিল, কই, আমাকেও তো কোনোদিন জানাসনি তোর একটা অ্যাফেয়ার আছে?

প্রিয়ব্রত চুপ করে হেসেছিল। তখন চঞ্চল পরের প্রশ্নটা করে—বলিস তো একবার মেয়েটার বাড়ি যেতে পারি। কী বলিস?

প্রিয়ব্রত ম্লান স্বরে বলেছিল, ছেড়ে দে। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। চঞ্চল জিজ্ঞেস করেছিল, তাহলে মাসিমা যেটা বলছিলেন ...?

-মা কী বলছিল?

–কয়েকটা সম্বন্ধ এসেছিল, তোকে নিয়ে মেয়ে দেখতে ...

—ডোন্ট বি রিডিকুলাস, চঞ্চল! তুই তো জানিস আমি বিয়ের জন্য মুখিয়ে নেই।

–তাহলে এটা কী ছিল?

–স্রেফ দু-ঘন্টার একটা স্বপ্ন!

–কোথায় পেলি মেয়েটাকে?

—ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। জলে দাঁড়িয়ে ভিজছিল।

–তাতে তুই এলি কী করে?

—দেখে বড্ড মায়া হল। কে জানে, ভালোও লেগে গিয়েছিল হয়তো! এগিয়ে গিয়ে ছাতা ধরলাম ওর মাথার ওপর।

-তারপর?

—তারপর পাশাপাশি হেঁটে ওকে বাড়ি পৌঁছে দিলাম।

—কোথায় থাকে?

-তালতলায়।

-কী নাম?

–অরুণা। অরুণা রায়।

এরপর চঞ্চল আর বেশিক্ষণ থাকেনি। হঠাৎ 'চলি' বলে হুট করে চলে গিয়েছিল। বলেও যায়নি ফের কবে আসবে।

আসেওনি দেড় মাস। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তখনও বেডরেস্টে প্রিয়ব্রত। যখন চঞ্চলের বিয়ের নেমন্তন্নের কার্ড এল—বাই পোস্ট! খামটা খুলে চঞ্চলের জ্যাঠা অরবিন্দ বসুর নামে কার্ডটা দেখেই রাগে রি-রি করে উঠেছিল গা'টা। উনিশ বছরের বন্ধুত্বের এই চেহারা! সেই কবে কলিন্স ইনস্টিটিউটে ক্লাস সিক্সে পড়তে পড়তে আলাপ, তারপর...নাঃ, আর ভাবতেও বিচ্ছিরি লাগছিল প্রিয়ব্রতর! ও কার্ডটা না পড়েই বিছানার মাথার কাছে

টেবিলে ছুড়ে ফেলে গত রাতের আধপড়া ডিটেকটিভ উপন্যাসটা তুলে নিয়েছিল।

কিন্তু বইয়ে মন বসল না। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা খচখচ করছে। বাল্যকালের বন্ধুর এই ব্যবহারটা হঠাৎ করে মনের সব শান্তি কেড়ে নিয়েছে। ছুড়ে ফেলেছে বটে চিঠিটা, কিন্তু সেটা যেন টেবিলে চিৎ হয়ে পড়ে ইশারায় ডাকছে প্রিয়ব্রতকে।

প্রিয়ব্রত দড়াম করে বইটা বন্ধ করে হাত বাড়িয়ে তুলে লাল প্রজাপতির ছাপ মারা 'শুভবিবাহ'-র কার্ডটা এবং তিনটি বাক্য পড়া হতে না হতেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। শাঁখারিটোলা স্ট্রিটের চঞ্চল বসুর সঙ্গে তালতলা অ্যাভেনিউয়ের অরুণা রায়ের বিবাহের হার্দ্য আমন্ত্রণ ছড়িয়ে আছে সোনালি কার্ডে সিঁদুর রঙে ছাপা চিঠিটায়। ফের একটা বিদ্যুল্লতার আলোয় উদ্ভাসিত অরুণার জলে ভেজা মুখটা। আহা কী নিটোল, নিস্পাপ, আর্ত একটা মুখ। চোখের চাহনিতেই যেন একটু সাহায্য চাইছে।

কার্ডটা পুরো পড়া হল না প্রিয়ব্রতর, ও কার্ডটা ফের ছুড়ে ফেলল টেবিলে, তারপর টেবিলের দেরাজ থেকে এগারো পৃষ্ঠার প্রেমপত্রটা বার করে শেষবারের মতো পড়ল আর তারপর কুটিকুটি করে ছিড়ে দলা পাকিয়ে জানলার বাইরে ছুড়ে ফেলল। বহুদিন পর এক গভীর বিষণ্ণতা ভর করল মনে, প্রিয়ব্রতর মনে হল অরুণার সেদিন উচিত হয়নি ওর ছাতার নীচে এসে দাঁড়ানো। আর যদি বা বৃষ্টি থেকে বাঁচতে দাঁড়ালই, কী প্রয়োজন ছিল প্রিয়ব্রতর হাতটা অত স্পষ্ট করে ধরার? ওই স্পর্শ, ওই অন্ধকারে আগলে আগলে চলা, ওই একরত্তি সংলাপ 'একটু দেরি হয়ে গেল' যদি প্রেম না হয় তাহলে প্রেম কী? ওই বিদ্যুতের আলোয় একে অন্যকে দেখা যদি লাভ অ্যাট

ফাস্ট সাইট না হয় তো প্রথম দর্শনের প্রেম আর কী হবে? অরুণা কী বুঝতে পারেনি যে ওই পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে প্রিয়ব্রত কতখানি বদলে গেছে?

টেবিল থেকে অরুণা বসুর চিঠিটা ফের তুলে নিল প্রিয়ব্রত। ও কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না এই চিঠিটা পেয়ে ওর ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে। তবু আরেকবার সেটা পড়ল ও, অরুণার হাতের লেখাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, তারপর কাজের লোক কাশীর নাম ধরে হাঁক দিল 'কাশী! কাশী! কিন্তু এসে পড়তে ভুলে গেল আদৌ কেন ডেকেছিল ওকে। অগত্যা বলতে হল, না, এখন আর তোকে লাগছে না। ঘন্টাখানেক পরে আরেকবার ঘুরে আসিস।

ঘন্টাখানেক পর কাশী ঘুরে আসতে প্রিয়ব্রত ওকে একটা খাম তুলে দিল আর বলল, তালতলায় যেখানে দুর্গাপুজোটা হয় তার উলটোদিকে সতেরো নম্বর বাড়িতে এটা দিয়ে আয়। পারলে অরুণা দেবীর নাম ধরে জিজ্ঞেস করবি, তিনি থাকলে তাঁর হাতেই চিঠিটা দিবি। না হলে ...

কাশী আর ওকে কথা শেষ করতে দিল না। ও ঠিক আছে, আমি বুঝে গেছি বলে কাঁধের গামছাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে রওনা দিল। আর অরুণার আমন্ত্রণের প্রত্যাখ্যানপত্র হাতছুট হয়ে বেরিয়ে গেছে বুঝে ফের একটা কষ্টবোধ অনুভব করতে শুরু করল প্রিয়ব্রত। ওর ফাঁকা বাড়িটা সহসা আরও বেশি ফাঁকা মনে হতে লাগল।

অরুণাকে পাঠানো চিঠির এক জায়গায় বেশ নির্মম স্বরে প্রিয়ব্রত লিখেছে— আপনি যে প্রশ্নগুলোর কথা লিখেছেন তার উত্তর জানার ইচ্ছে হয়তো আমার আছে, কিন্তু এত দেরিতে জেনে কাজ কী? এ ছাড়া আমার সম্পর্কেও আপনার যেসব প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক সেগুলির উত্তর আমার কাছে নেই। যেমন, আমি জানি না আমি বিয়ে করলাম না কেন। কিংবা ব্যাচেলর জীবনে আমার খুব

একলা লাগে কিনা। কিংবা আরও কঠিন প্রশ্ন—কেমন আছি? কী করে সময় কাটাই?

কাশী চলে যেতে প্রিয়ব্রতর উৎকণ্ঠা ক্রমশ বাড়তে লাগল। নিজের চিঠির ভাষা নিয়ে একটা লজ্জা লজ্জা ভাব গড়ে উঠতে লাগল। অরুণা তো সত্যিই প্রিয়ব্রতর জীবন নিয়ে কিছু জানতে চায়নি, নিজেরই ক-টা কথা বলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিল।

তাতে কি প্রিয়ব্রতর অমন একটা পত্রাঘাতের প্রয়োজন ছিল? আরও বিনীতভাবেই কি না যাওয়ার কথাটা বলা যেত না? কে জানে, এহেন প্রত্যাখ্যান কি মানুষ ভয় থেকে করে বসে? বাস্তব থেকে সরে দাঁড়ানোর কঠিন চাপে? প্রিয়ব্রতর মনে পড়ে গেল ওঁর প্রথম যৌবনের সেরা সঙ্গী সেন্ট অগাস্টিনের কনফেশনজ গ্রন্থের একটা উক্তি; বলেছিলেন—অধিকাংশ মানুষের পক্ষে নিখুঁত মিতাচার অভ্যাস করার থেকে কোনো নেশাকে সম্পূর্ণ পরিহার করা অনেক সহজ। প্রিয়ব্রত আপনমনে একবার আউড়ে নিল খ্রিস্টান সন্তের কথাটা—টু মেনি, টোটাল অ্যাবস্টিনেন্স ইজ ইজিয়র দ্যান পার্ফেক্ট মডারেশন।

ফের একটু দেরি করে ফেলেছে প্রিয়ব্রত। চিঠিটা পাঠিয়ে দেওয়ার পর ভাষা ও ভাবের কথাটা মনে এল। এখন কাশীর পিছন পিছন রওনা হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। অথচ তাতে যে কী সুফল বর্তাবে তাও তত খেলছে না মাথায়। তালতলা আর কতটুকু দূরত্ব। জামাকাপড় বদলে রওনা দিতে দিতে কাশী তো ওবাড়ি পৌঁছেই যাবে। আর অরুণার মুখোমুখি হয়ে প্রিয়ব্রত বলবেটাই বা কী? চিঠির বয়ান ভুলে যান, এই আমি হাজির। এটা কী বলার মতো কথা? এরকম সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে ও ক্লান্ত বোধ করে একটা সিগারেট

ধরিয়ে গা এলিয়ে দিল ইজিচেয়ারে। মনের যা পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে এর মধ্যে তাতে সন্ধ্যেবেলায় ওকে অরুণাদের বাড়ি একবার যেতেই হচ্ছে।

সিগারেটটা শেষ করে চোখ বুজে বসেছিল কিছুক্ষণ প্রিয়ব্রত, ঘরের পর্দা সরার আওয়াজে চোখ খুলতে দেখল কাশী হাতে একটা খাম নিয়ে দাঁড়িয়ে। বলল, দাদাবাবু, দিদিমণি এই চিঠিটা তোমায় দিল।

প্রিয়ব্রত খামটা নিয়ে চিঠিটা বার করে দেখল কেবল একটা বাক্য লিখে পাঠিয়েছে—'আমি অপেক্ষা করব।' কাগজটায় না আছে কোনো সম্বোধন, না কোনো স্বাক্ষর। অথচ তিনটি শব্দের চিঠি এক ভয়ানক দাবি বহন করে এনেছে। এরপর না যাওয়ার আর কোনো পথই রইল না প্রিয়ব্রতর, যাওয়াটা অনেক সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে গেল অতঃপর। প্রিয়ব্রত ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাড়ি কামানোর তোড়জোড় শুরু করে দিল।

সন্ধ্যায় কফির কাপটা প্রিয়ব্রতর দিকে বাড়িয়ে দিতে দিতে অরুণাই কথা শুরু করল, যেসব প্রশ্ন করব ভেবে আপনি ভয় পাচ্ছিলেন তার সব উত্তর তো আমি পেয়েই গেছি।

চমকে উঠে প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল, কী করে?

—কেন, আপনার চিঠি পড়ে!

কোনো নিঃসঙ্গ লোক ছাড়া অমন সন্ত্রস্ত হওয়ার কারণ তো কারও নেই।

—আর কী বুঝলেন?

-বুঝলাম যে সেই সন্ধ্যের ভালোলাগাটা অ্যাদ্দিনেও মুছে যায়নি।

নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে পড়ল প্রিয়ব্রতর বুক থেকে। বুকটা একটু হালকা হতে ও জিজ্ঞেস করল, আপনি কী মনের ডাক্তারি পড়েছেন?

অরুণা হেসে বলল, এইটুকু বোঝার জন্য সাইকোলজি পড়তে হয় না, এটা সব মেয়েই কমবেশি পারে। না, আমার বিষয় সাইকোলজি নয়, অনকোলজি। মানে ক্যান্সার।

প্রিয়ব্রত কিছুটা রসিকতার ছলে কীরকম আনমনে বলল, না। ওই রোগটা এখনও ধরেনি। ধরলেই পারে। আজকাল তো...।

প্রিয়ব্রতকে কথা শেষ করতে দিল না অরুণা-কপাল এমনই, আমার এই বিদ্যে দিয়েই চিকিৎসা করতে হল আপনার বন্ধুকে।

কফির কাপটা প্লেটে ঠনঠন করে কেঁপে উঠেছিল প্রিয়ব্রতর হাতে, ও প্রায় ছিটকে উঠল যেন সোফা থেকে, কী বলছেন কী, অরুণা! চঞ্চলের ... কথাটা আর শেষ হল না প্রিয়ব্রতর, তার আগেই গলাটা ভেঙে গেল।

অরুণা চোখ বুজে মাথা ঝাঁকিয়ে শান্তভাবে বলল, হ্যাঁ। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। দু-জনের কারওই কিছু বলার বা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছেটুকুও রইল না। আর সেই নীরবতায় প্রিয়ব্রত প্রথম ভোলা দৃষ্টিতে দেখল অরুণাকে।

দেখল অরুণার সিঁথিতে সিঁদুর নেই। অবশ্য লণ্ডনে প্র্যাক্টিস করা ডাক্তার সিঁদুর না-ই পরতে পারে। তবে সরু নীল পাড়ের সাদা সুতির শাড়িটার মধ্যেও কোথায় যেন একটা চাপা বিষণ্ণতা। অরুণার ফর্সা, সুন্দর মুখটায় কয়েকটা অকাল বলিরেখা। একটা আবছা ক্লান্তির ভাব। চোখদুটোয় একটা

স্তব্ধ কান্না। ওকে দেখতে দেখতে বুকে কান্না জমছিল প্রিয়ব্রতর। ওর হাতে ধরা কফিটা ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে এল।

ওই ঠাণ্ডা কফিতেই চুমুক দিয়ে প্রিয়ব্রত বলল শেষে, হ্যাঁ, আপনার বোধ হয় কিছু বলবার ছিল? অরুণা চোখ খুলে একমুহূর্ত কী ভেবে, তারপর বলল, কথাটা আপনার বন্ধুর।

-কী বলেছিল চঞ্চল?

–ক্ষমা চেয়েছিল আপনার কাছে।

–ক্ষমা? আমার কাছে? কেন?

–এটুকুই বলতে বলেছিল। বলেছিল আপনি বুঝবেন।

প্রিয়ব্রতর মনের মধ্যে ফের সেই সন্ধ্যার অন্ধকার আর বিদ্যুতের ঝলকানি খেলে গেল। আর সেই বিদ্যুৎচমকে অরুণার সেই বৃষ্টিধোওয়া মুখ আর একজোড়া অসহায় চোখ। সত্যিই তো, বোঝার কিছুই বাকি রইল না প্রিয়ব্রতর। চঞ্চলের কাছে সেই সন্ধ্যার বর্ণনাই ভুল সুরে আলাপ ধরার মতন হয়ে গিয়েছিল। প্রিয়ব্রত পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরাল। বিব্রত বোধ করলে ওর বিশ্বস্ত সঙ্গী হল সিগারেট। সিগারেটের প্রথম ধোঁয়াটা সন্তর্পণে ছাড়তে ছাড়তে শুনল অরুণা বলছে— আপনার বন্ধুও শেষ অবধি সিগারেটটা ছাড়তে পারেনি।

হঠাৎ সিগারেটের স্বাদটা কেমন কটু হয়ে এল মুখের মধ্যে ; প্রিয়ব্রত সিগারেটটা টিপে নিভিয়ে ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে। তারপর উদবিগ্নভাবে চেয়ে

রইল অরুণার মুখের দিকে, কিছু শোনার জন্য। অরুণা বলল, সিগারেটটা নষ্ট করলেন?

প্রিয়ব্রত বলল, জিনিসটাই তো নষ্ট। ওর আর নষ্ট করার কী আছে?

অরুণা বলল, আপনার বন্ধু সব কিছু ছাড়তে পেরেছিল। কেবল সিগারেটটাই পারেনি।

প্রিয়ব্রত মগজে একটা শিহরন বোধ করল, সব কিছু ছেড়েছিল মানে?

—যেমন ডাক্তারির প্র্যাক্টিসটাই।

—সে কী? কী করত তাহলে?

—একটা রিটার্ডেড শিশুদের ইস্কুলে ভলান্টারি সার্ভিস। আর বাকি সময়ে একটা উপন্যাস লিখত বাংলায়।

প্রিয়ব্রতর কৌতূহল তখন আর বাধা মানছে না ; চঞ্চলের মতো বাস্তবিক চঞ্চলমনা ও চঞ্চলস্বভাব ছেলে প্রতিবন্ধী শিশুদের সেবায় আর উপন্যাস লেখায় ব্যস্ত।

মানুষটার হয়েছিল কী?

প্রিয়ব্রত যে রীতিমতো চমকে গেছে তা আঁচ করে অরুণা বলল, সবটাই ঘটল ওর ক্যান্সার ধরা পড়ায়। ওর দুরারোগ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সন্ধ্যেবেলায় একেবার অন্তত পাব-এ টু মেরে বিয়ার খাওয়া, চলনে-বলনে, কেতা-কানুনে ব্রিটিশের মতো ব্রিটিশ হয়ে ওঠা, সপ্তায় একবার করে ওয়াই এম সি-তে ব্যাডমিন্টন

খেলা এবং একশো অজুহাতে দেশে না-ফেরা—সবই নিমেষে উবে গেল লিভারে ক্যান্সার ধরা পড়ায়। হঠাৎ করে ওর মনে হল সেদিন ও একটা ভুল জীবনযাপন করে এসেছে এতদিন। বলল, যে-ক-টা দিন বাঁচি একটু সংশোধন করে নেব নিজেকে।

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করল, প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কাজ আর উপন্যাস লেখা কি ওর প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গ?

অরুণা বলল, হ্যাঁ। আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনাও প্রায়শ্চিত্ত।

—কিন্তু কেন? আমার প্রতি কী অন্যায় করেছে ও?

–আপনাকে ক্ষমা করতে পারেনি বলে।

–কেন, কীসের ক্ষমা?

–আমাকে এক সন্ধ্যার ভালোবাসার জন্য।

ফের নীরব হয়ে পড়ল প্রিয়ব্রত ও অরুণা। এরপর কথা চালাবার মতো ভাষা বা বিষয় হারিয়ে ফেলেছে দু-জনই। দু-জনেরই একটু একটু কষ্ট হতে লাগল চঞ্চলের জন্য। মাত্র একটা সন্ধ্যের কারণে একটা মানুষ এত কষ্ট পেতে পারে। শেষে ঠিক এই প্রশ্নটাই অরুণাকে করে বসল প্রিয়ব্রত-চঞ্চলটা এত সেন্সিটিভ ছিল? নাকি সন্দেহবাতিক?

অরুণা বলল, ঠিক বুঝতে পারিনি কোনোদিন। যে কারণে দেশে এসে কখনো দেখা করিনি। ও তো আসেনি কোনোবারই।

-তাহলে এবার দেখা করলেন...

—এ তো ওরই চাওয়া বলেছিল, দেখা করে ওকে বোলো আমি ওকে ভুলিনি। ঘৃণাও করিনি। শুধু ভালোবাসাটা থমকে গিয়েছিল।

-কেন? অরুণা ওর পাশে রাখা একটা মস্ত ফাইল তুলে নিয়ে প্রিয়ব্রতর দিকে এগিয়ে ধরল— বলেছে, সব ধরা আছে এতে।

—ওর উপন্যাস।

–আপনি পড়েছেন?

অরুণা নম্রভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে বোঝাল হ্যাঁ।

—কেমন বুঝলেন?

—সে তো আপনি বলবেন।

–কেন, আপনি নন?

—কারণ এটা আপনার আর ওর বোঝাপড়া।

প্রিয়ব্রত ভারী ফাইলটা আস্তে আস্তে খুলে প্রায় ছ-শো পাতার পান্ডুলিপিটা বার করল। আর থমকে গেল উপন্যাসের শিরোনামে। বড়ো বড়ো হস্তাক্ষরে সাইন পেনের কালো, মোটা কালিতে লেখা সেই আশ্চর্য সন্ধ্যা।

অরুণা বলল, গোটা উপন্যাসটাই একটি সন্ধ্যার বিবরণে লেখা।

প্রিয়ব্রতর হাতদুটো কাঁপছিল, ও কোনোমতে শিরোনাম পৃষ্ঠা সরিয়ে পরের পাতায় এল —উৎসর্গপত্রে। সেখানে শুধু—অরুণাকে। তারপর পৃষ্ঠা উলটে যে-পাতায় এল সেখানে শুধু একজন কবির একটা পঙক্তির উদ্ধৃতি। জোসেফ ব্রডস্কি-র একটা লাইন : অ্যাজ ডার্ক অ্যাজ দ্য ইনসাইড অব আ নিডল। একটা ছুঁচের মধ্যে নিহিত অন্ধকারের মতো।

প্রিয়ব্রতর বড়ো বড়ো শ্বাস উঠতে লাগল। ও বুঝতে পারল না এ উপন্যাস নিয়ে ও কী করবে। তবু অদম্য টান অনুভব করছে ও লেখাটা একনিমেষে পড়ে ফেলার। ও পাতা উলটে উপন্যাসের প্রথম পাতায় গেল...

ওয়েলিংটন পার্কের অন্ধকারে হঠাৎ আকাশ-জমি আলো-করা এক বিদ্যুৎচমকের আলোয় অরুণ প্রথম দেখল প্রিয়াকে। বিদ্যুৎ মিলিয়ে যেতে যে-ঘন, সজল অন্ধকার ঘিরে ফেলল চারপাশ, সেই অন্ধকারে ফের প্রিয়াকে দেখল অরুণ। আর দ্বিতীয় দেখাটা আরও গভীর, কারণ এতে বিদ্যুতের ছলনা নেই। ওর মনে হল সিক্তবসনা মেয়েটিকে ওর ছাতার নীচে আসতে বলবে, কারণ ওভাবে বুকে বই আঁকড়ে ও এই জলের মধ্যে কার অপেক্ষায়? এক ছাতার নীচে এলে দু-জনেই ওরা সমান ভিজবে, কিন্তু সমান উষ্ণও হবে। বর্ষার সন্ধ্যার চেয়ে প্রেমে পড়ার মতো ভালো সময় হয় না।...

আর পড়তে পারছিল না প্রিয়ব্রত, লেখাটাকে ওর অলৌকিক মনে হচ্ছিল। ওর আর অরুণার মনস্তত্ত্ব ঘেঁটে এ কী সাংঘাতিক প্রতিশোধ চঞ্চলের! এতশত ও জানল কী করে? কোত্থেকে?

অরুণা ম্লান হেসে বলল, না, আমি কিছুই বলিনি ওকে। সবই ওর নিজের কল্পনা। বলেছিল, কল্পনাই নাকি তৃতীয় নয়ন। ও চোখ বুজলেই নাকি আপনি,

মানে প্রিয়ব্রত হয়ে যায়। তাই গোটা উপন্যাসটা আপনার দৃষ্টিতে লেখা। আমি একটা চরিত্র আর উপলক্ষ্য মাত্র।

ঠিক তখনই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। প্রিয়ব্রত বলল, লেখাটা নিয়ে যাচ্ছি। পড়া হলে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

অরুণা উৎকণ্ঠার স্বরে বলল, কিন্তু আপনি যাবেন কী করে? কী সাংঘাতিক বৃষ্টি!

-কেন, আপনি যদি একটা ছাতা ধার দেন।

–তা তো পারি, কিন্তু এ যা বৃষ্টি। আপনার চশমায়...

–না, ও আমার অভ্যেস আছে।

অরুণা বলল, প্রিয়, যদি ছাতা ধরে পাশাপাশি আসি?

কী একটা ভেবে একটু চুপ থেকে প্রিয়ব্রত বলল, না থাক, সন্ধ্যেটা ভালো নয়।